যুগ পরিক্রমায় সিয়াম সাধনা ও শিক্ষা

মোঃ মাসুম বিল্লাহ আল-আজহারী

ঘন্টা চক্রে আসে নামায, দিনের ঘূর্ণায়নে আসে তাহাজ্জুদ, সপ্তাহ পেরিয়ে আসে জুমআ, মাস পেরিয়ে আগমন করে আইয়ামে বিদ এবং বছর পেরিয়ে রহমত, মাগফিরাত আর নাজাতের সওগাত নিয়ে উপস্থিত হয় মাহে রমজানের রোজা। যাকে স্বাগত জানানোর জন্য বছরের শুরুতে জান্নাতকে সাজানো হয় বিভিন্ন কারুকার্য। বয়ে যায় চক্ষু জুড়ানো শীতল হাওয়া। আর বান্দাকে ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতিতে অভিশপ্ত শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয়, বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের দরজাগুলোকে। একটি মাত্র নির্দেশ যা রমজানে রোজা রাখার কর্তব্যেরই ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم (البقرة:38)

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল। এ আয়াত শত-সহস্র বার পড়েছি কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী জাতি কারা? কি ধরন ছিল তাদের রোজার? এ প্রশ্নের জোয়ার মনের বাঁধে বহু বার ধাক্কা দিয়েছিল। তা জানার পাশাপাশি সকল যুগের সকল ধর্মের রোজার ধরন কি? এবং তার শিক্ষা কি? তা জানার চেষ্টা এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

পুরাতন মেক্সিকো সভ্যতার সাধনা:

পুরাতন মেক্সিকো জ্যোতিষীদের মধ্যে রোযার প্রচলন ছিল, তারা কথা বলা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার জন্য দিনের শুরুতে জিহ্বা ছিদ্র করে কাঠের টুকরো মুখের সাথে মজবুত করে বাধত। এ রোযার উদ্ভব হয় মেক্সিকোর এক সাধু থেকে। সে একাধারে ১৬০ দিন এভাবে রোযা রেখেছিল, এবং এর মাধ্যমে সে তাদের মাঝে খোদাতুল্য গণ্য হল। এদের রোযা ছিল খাবার, পানীয়, কথা ও কাজ পুরোপুরি বর্জন করা। তারা রোযা শুরু করত সূর্যাস্ত থেকে এবং শেষ করত সূর্যোদয় দিয়ে, যদি সূর্য মেঘে ঢাকা থাকত তাহলে সূর্য প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত রোযা অব্যাহত রাখত।

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে সিয়াম সাধনা:

তাদের রোযা ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। তারা প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৫ তারিখ রোযা শুরু করে নতুন মাসের আগমনে ইফতার করত। ইফতারের সময় তারা কোরবানির বস্তু নিয়ে মূর্তির কাছে নতশিরে প্রণাম করতে করতে মূর্তির সামনে উপস্থিত হত, প্রণাম শেষ হলে ইফতার করত। (মুকাদ্দিমাতু ইবনি নাদিম)

"বারহামিয়া" তাদের রোযার প্রকৃতি ছিল আরেকটু ভিন্ন রকমের। তারা প্রত্যেকদিন এক ঘন্টা অথবা তার চেয়ে একটু বেশি সময় রোযা রাখত। সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে পশ্চিমাকাশে সাদা রেখা উদয় হয়ে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এ সময়ে তারা খাদ্য এবং পানীয় থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে রোযা পালন করত। (আস-সাওমু ওয়াল উদহিয়াই)

বৌদ্ধ ধর্মে রোযা পালন করত প্রত্যেক মাসের এক, নয়, বার এবং পনের তারিখে। অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে তারা চারটি রোযা রাখত। (আল-হুকামাউস সালাসা)

প্রাচীন মিশরীর সভ্যতায় সিয়াম সাধনা:

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় রোযা উপাসনালয়ের খাদেম ও পুরোহিত এই দুই শ্রেণীর জন্য ফরজ ছিল। এদের রোযার ধরন ছিল তারা একাধারে এক সপ্তাহ পানি ছাড়া অন্যান্য সকল খাবার থেকে বিরত থাকত। পরবর্তীতে এই রোযাকে ৪২ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আর পুরোহিতদের রোযা ছিল, তারা একাধোরে ১০ দিন গোশ্ত এবং মদ পান করা থেকে বিরত থাকত। (দিয়ানাতু মিসর আল কাদিমা) আর তৎকালীন মিশরীয় সাধারণ জনগণের রোযা ছিল বছরে চার দিন। তারা রোযা শুরু করত তৃতীয় মাসের ১৭ তারিখ থেকে।

পারস্য ও রোম সভ্যতায় সিয়াম সাধনা:

খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫৭ সালে পিথাগোরাসের জন্ম হয়। তার সমসাময়িক সমাজের অবস্থা ছিল, মানুষ নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করার জন্য একাধারে ৪০ দিন সকল ধরনের খাবার থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে রোযা পালন করত। যাতে তারা নিজেদেরকে তাদের কল্পিত রবের জন্য কোরবান করতে পারে। পিথাগোরাস সিংহাসনে আরোহণ করে মানুষ পশু-পাখিসহ অন্যান্য প্রাণী ভক্ষণ করছে দেখে ঘোষণা দিলেন প্রাণী জগৎ মানুষ পুনর্জন্মের ফসল, সুতরাং কারো জন্য প্রাণী ভক্ষণ করা বৈধ নয়। এমন কি পেয়াঁজ-রসুন ভক্ষণ করাকেও হারাম করলেন।

এতক্ষণের কথা ছিল মানব রচিত ধর্মে সিয়াম সাধনা নিয়ে, এবারে দেখব আসমানি ধর্মে সিয়াম সাধনার ধরন কি ছিল:

আদমের (আ:) সিয়াম সাধনা

আদি পিতা হযরত আদম (আ:) জান্নাতে কিছুদিন অবস্থানের পর বাকি জীবন অতিবাহিত করেন দুনিয়ায়। আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে নির্দিষ্ট একটি গাছের নিকটবর্তী হওয়া থেকে নিষেধ করেছিলেন, কতিপয় ওলামা একে রোজা হিসেবে চিহ্নিত করেন। অধিকাংশ ওলামায়ে কিরাম জান্নাতকে "মাকানে তাকরিমি" তথা সম্মান সূচক স্থান হিসেবে আখ্যা দিয়ে উপরোক্ত ওলামাদের কথাকে রদ করেন। (আল ফুতুহাতুল ইলাহিয়্যাহ, তৃতীয় খন্ড)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'আইয়ামে বিদ' ও 'আশুরার' রোযা ছাড়া অন্য কোন রোযা ছিল না। এ ব্যাপারে সাক্ষ্য বহন করার মত অনেক দলিল রয়েছে। এরপর ইসলাম সকল যুগের এবং সকল ধর্মের রোযাকে সমন্বয় সাধন করেছে রমজানের রোযা ফরজ করার মাধ্যমে। যদিও প্রথম বছর অর্থাৎ ২য় হিজরিতে রোযা ফরজ হওয়ার পর "রোযা রাখা ও ফিদয়া দেওয়ার" মধ্যে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী বছর অর্থাৎ হিজরি ৩য় বছর রোযা রাখাকে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়।

হযরত নূহের (আ:) সিয়াম সাধনা

হযরত নূহের (আ:) রোযার ব্যাপারে মুসনাদে আহমদের একটি হাদিস উল্লেখযোগ্য "হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা:) কতিপয় ইহুদিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা আশুরার দিনে রোযা রেখেছিল, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা:) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন এটা কিসের রোযা? তারা বলল, এই দিনে হযরত মুসা (আ:) আল্লাহ তায়ালা, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রোযা রেখেছিলেন যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাকে ও বনি ইসরাইলকে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিলেন। এই দিনেই হযরত নূহের (আ:) জাহাজ জুদি পাহাড়ে নোঙর করল তিনি আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রোযা রেখেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, এদিনে রোযা রাখার ব্যাপারে আমরাই বেশি হকদার এবং সাহাবাদেরকে রোযা রখাতে আদেশ দিলেন। (ফাতহুল বারী)

হযরত যাকারিয়ার (আ:) সিয়াম সাধনা

হযরত যাকারিয়া (আ:) রোযার ধরন ছিল, খানা-পিনা ঠিক রেখে তিন দিন মানুষের সাথে কথা বর্জন করা। স্বয়ং কুরআনই এ কথার সাক্ষ বহন করেন:

قال ربى اجعل لى آية قال ايتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزًا (آل عمران:41)

অর্থাৎ "হে রব আমার জন্য একটি নিদর্শন পেশ করুন, আল্লাহ বললেন তোমার নিদর্শন হলো তিন দিন মানুষের সাথে ইশারা ছাড়া কথা বলবেনা"। (সূরা আলে ইমরান; ৪১)

হযরত মুসার (আ:) সিয়াম সাধনা:

হযরত মুসা (আ:) সিনাই পর্বতে অবস্থানকালীন ৪০ দিন রোযা রেখেছিলেন। আল্লাহর সাথে ওয়াদা শেষ হলে শরিয়ত নিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ফিরেন। কুরআনে এসেছে:

واذ واعدنا موسى اربعين ليلة (البقرة: 51)

অর্থাৎ "আর যখন আমি মুসার (আ:) সাথে ৪০ দিনের চুক্তি করেছিলাম"। (সূরা বাকারা: ৫১) তাফসিরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত মুসা (আ:) ৪০ দিন পুরোটাই রোযা অবস্থায় ছিলেন। আর মুসা (আ:) এর রোযার ধরন ছিল, তিনি খাবার, পানীয় ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত ছিলেন। (ওল্ড টেষ্টামেন্ট) আর বনি ইসরাইলরা বছরে এক দিন রোযা রাখত, যা তাদের উপর ফরজ ছিল। এছাড়া বাকি যে রোযা তারা রাখত তা তাদের জন্য নফল ছিল। আর রোযার ধরন ছিল, তারা রোযা শুরু করত ইবরিয়াহ বছরের প্রথম মাস "তাসরী" এর নবম তারিখে মাগরিবের ১৫ মিনিট পূর্বে শুরু করে ১০ তারিখে মাগরিবের ১৫ মিনিট পরে ইফতার করত। উল্লেখ্য যে তারা রোযাকে ২৫ ঘন্টা পূর্ণ করত।

হযরত দাউদের (আ:) সিয়াম সাধনা

হযরত দাউদের (আ:) উপর রোযা ফরজ ছিলনা; বরং তিনি নফল হিসেবে একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন ইফতার করতেন। এ রোযাই উম্মতে মোহাম্মাদীর জন্য নফল হিসেবে পরিগণিত হয়। এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) বলেন, দাউদের (আ:) রোযা কি রকম ছিল? জবাবে রাসূল (সা:) বললেন, আমি তার চেয়ে বেশি রোযা রাখতে শক্তি রাখি। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন তার রোযার চেয়ে উত্তম রোযা নেই। (আল বুখারী)

হযরত মারইয়ামের (আ:) সিয়াম সাধনা

কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী হযরত মারইয়াম (আ:) রোযা রেখেছিলেন। তাঁর রোযার ধরন কি ছিল, এ সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্ট এসেছে: "তুমি খাও, পান কর এবং চোখকে শীতল কর আর মানুষ দেখলে ওদেরকে বলে দাও আমি রবের জন্য রোজার মানত করেছি সুতরাং আজ আমি তোমাদের সাথে কথা বলব না"। (সুরা মারইয়াম: ২৬) এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে, হযরত মারইয়ামের (আ:) রোযা ছিল খানা-পিনা ঠিক রেখে শুধু মানুষের সাথে এক দিনের জন্য কথা বর্জন করা।

খ্রিষ্ট ধর্মে সিয়াম সাধনা

খ্রিষ্টানদের একটি গ্রুপ "ক্যাথলিক"। তাদের রোযার ধরন ছিল, মধ্য রাত থেকে শুরু হয়ে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এবং তারা কেবল খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকত, অন্য কিছু থেকে নয়। শুক্র শনিবারের রোযাকে এরা অবশ্যপালনীয় মনে করত না। অনুরূপভাবে তারা ঈদ উদ্‌যাপন করত না। কেউ ১৫ বছর বয়সে উপনীত হলে তার উপর রোযা ফরজ হত এবং পুরুষরা ৬০ বছর এবং মহিলারা ৫০ বছরে উপনীত হলে তাদের থেকে রোযা রহিত হয়ে যেত। (আসসিয়াম মিনাল বিদায়াতি হাত্তাল ইসলাম) তাদের আরেকটি গ্রুপ যাদের আকীদা-বিশ্বাস ও সিয়ামের ধরন ক্যাথলিকদের থেকে একটু ভিন্ন রকমের ছিল। তারা ২৫ নভেম্বর থেকে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ৪০ দিন রোযা রাখত। এ রোযাকে সওমুল ওলাদা (যিশু জন্মের রোযা) বলা হয়। তারা যিশুর জন্মের এক দিন পূর্বে রোযা শেষ করে যিশুর জন্মের ঈদে জড়ো হত। এছাড়া তারা বুধ ও শুক্রবার রোযা রাখত। (আসসিয়াম মিনাল বিদায়াতি হাত্তাল ইসলাম) খ্রিষ্টানদের আরেকটি গ্রুপ, তারা নিজেদের উপর রোযাকে ফরজ মনে করত না; বরং মুস্তাহাব মনে করত। উল্লেখ্য যে, ঈসার (আ:) উপর রোযা ফরয ছিল না, খ্রিষ্টানরা নিজেদের উপর রোযা ফরয করে নিয়েছিল।

ইসলামী শরিয়তে সিয়াম সাধনা

ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'আইয়ামে বিদ' ও 'আশুরার' রোযা ছাড়া অন্য কোন রোযা ছিল না। এ ব্যাপারে সাক্ষ্য বহন করার মত অনেক দলিল রয়েছে। এরপর ইসলাম সকল যুগের এবং সকল ধর্মের রোযাকে সমন্বয় সাধন করেছে রমজানের রোযা ফরজ করার মাধ্যমে। যদিও প্রথম বছর অর্থাৎ ২য় হিজরিতে রোযা ফরজ হওয়ার পর "রোযা রাখা ও ফিদয়া দেওয়ার" মধ্যে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী বছর অর্থাৎ হিজরি ৩য় বছর রোযা রাখাকে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ

فمن شهد منكم الشهر فليصمه (البقرة: 185)

সুতরাং যে রমযান মাস পাবে সে যেন রোযা রাখে। (আল বাকারা : ১৮৫)

রোযা আসলেই কঠিন একটি ইবাদত। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা সহজভাবে বান্দার কাছে পেশ করার জন্য অনেকগুলো পন্থা অবলম্বন

CamScanner

করেছেন। তার মধ্যে একটি পন্থা যা আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তীদের উপর পেশ করেছেন: "যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল"। অর্থাৎ এই কঠিন ইবাদত শুধু তোমাদের উপরই ফরজ করা হয়নি, বরং তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও ফরজ করা হয়েছিল। পূর্ববর্তী উম্মতের রোযার বিধান জানানোর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের উপর রোযা রাখাকে সহজ করে দিয়েছেন।

বিভিন্ন জাতি ও ধর্মে সিয়ামের রূপ-রেখা বর্ণনার পরে, এখন সিয়াম ফরজ করার অন্তরালে কি কারণ বা শিক্ষা রয়েছে, তা তুলে ধরার প্রয়াস পাব

সিয়াম সাধনা ও শিক্ষা

১। আল্লাহ ভীতি অর্জন:
আল্লাহ তায়ালা সূরা আল বাকারার ১৮৩ থেকে ১৮৭ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত এই পাঁচটি আয়াতের মাধ্যমে রামাযান মাসে সিয়াম সাধনা ফরজ করেছেন। রামাযানে সিয়াম সম্পর্কে এই পাঁচ আয়াত ছাড়া অন্য কোন আয়াত কুরআন কারীম এ পাওয়া যায় না। সূরা আল বাকারার এ আয়াতগুলোর দিকে গবেষণার দৃষ্টিতে তাকালে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ তায়ালা রামাযানে সিয়াম সাধনার কথা শুরু করেছেন-

(لعلكم تتقون) (البقرة: 183)

অর্থাৎ "সিয়াম তোমাদের উপর ফরজ করা হলো যেন তোমরা আল্লাহ ভীতি অর্জন করতে পার।" (আল-বাকারা : ১৮৩) এরপর ১৮৪ ও ১৮৫ নং আয়াতে সিয়ামের আহকাম, ১৮৬ নং আয়াতে রামাযানে আল্লাহর কাছে দোয়ার গুরুত্ব আলোচনা করেছেন। সর্বশেষ ১৮৭ নং আয়াতের প্রথমাংশে সিয়ামের শুরু ও শেষ সময় বর্ণনার পাশাপাশি ই'তিকাফের আলোচনা করেছেন এবং আল্লাহ তায়লা রামাযানে সিয়ামের আলোচনা পেশ করেছেন এভাবে

-((تلك حدود الله فلا تقربو ها- كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون)) (البقرة:187)

অর্থাৎ "সিয়াম সম্পর্কে এটা হলো আল্লাহর সীমারেখা, এ সীমাকে অতিক্রমতো দূরের কথা এর কাছেও যেওনা। এভাবে আল্লাহ তার আয়াত মানুষের সামনে পেশ করেন যেন তারা আল্লাহ ভীতি অর্জন করতে পারে।" (আল-বাকারা-১৮৭) তাহলে প্রমাণিত হলো- আল্লাহ তায়ালা রামাযানের সিয়ামের আলোচনা শুরু করেছেন তাকওয়া দিয়ে এবং আলোচনার ইতি টেনেছেন তাও তাকওয়ার মাধ্যমে। সুতরাং সিয়ামের মূল শিক্ষা হলো "তাকওয়া"। যার দৃষ্টান্ত হলো- আল্লাহ তায়ালা কতকগুলো হালাল কাজ যেমন খাবার-পানীয় ও আল-মুবশারাহ কে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে অবৈধ করে তাকিয়ে দেখেছেন কে তাঁর নির্দেশকে মান্য করছে আর কে তা অমান্য করছে। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা শিক্ষা দিচ্ছেন মানুষ যেন সর্বদাই তাঁকে ভয় করে তার নির্দেশকে মান্য করে এবং নিষেধকে বর্জন করে।

২। একত্ববাদের আহ্বান:
সিয়ামের আরেকটি অন্যতম শিক্ষা হলো- সিয়াম মানবজাতিকে ঐক্যের খাঁচায় আবদ্ধ করে। এক সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট জীব ও এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে মানবজাতির মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবেনা। ধীন-গরিব, রাজা-প্রজা, শিক্ষক ছাত্র, বাইলা তলার মালিক-বাশ তলার অধিবাসী লেখক-পাঠক এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই আল্লাহর সহমর্মিতার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে এটাই আল্লাহ চান। যার দৃষ্টান্ত হলো-

প্রথমত: আল্লাহ তায়ালা সবাইকে এক ডাকের ভিতর অন্তর্ভুক্ত করে সম্বোধন করলেন- (يا أيها الذين آمنو كتب عليكم الصيام) অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হলো"। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ কোন গোষ্ঠীকে সম্বোধন করেন নাই বরং সকল মানবতাকে একটি শব্দের ভিতরে আবদ্ধ করে ডাক দিলেন হে ঈমানদারগণ! এ ডাকের মাধ্যমে আল্লাহ ঐক্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

দ্বিতীয়ত: সকল মানবতার সিয়াম হবে একই নিয়মে, সুবহে সাদেক থেকে আরম্ভ করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এ সময় খাবার পানীয় মুবাশারাত ও বেহায়াপনা ত্যাগ করা। কাজেই সকলে একই সময়ে সাহরী গ্রহণ করে একই সময় ইফতার করবে। আল্লাহ তয়ালা ঘোষণা দিয়া দিলেন-

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيط من الخيط الأسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى اليل (البقرة: 187)

অর্থাৎ এবং তোমরা সুবহে সাদিক পর্যন্ত খাও ও পানাহার কর, অতঃপর রাত্রির আগমন পর্যন্ত তোমাদের সিয়ামকে পূর্ণ কর" (আল-বাকারা-১৮৭) কাজেই সকলকে একই সময় সিয়াম শুরু ও শেষ অর্থাৎ একই নিয়মে সিয়াম পালনের নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে ঐক্যের শিক্ষা দিলেন।

তৃতীয়ত: সারা পৃথিবীর মানুষকে একই মাস অর্থাৎ রামাযান মাসেই সিয়াম পালনের নির্দেশ দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ আরেকটি ঐক্যের দৃষ্টান্ত পেশ করলেন। ঘোষণা দিলেন-
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (البقرة:185)
অর্থাৎ "সুতরাং তোমাদের যেই রামাযান মাস পাবে সেই যেন সিয়াম পালন করে"। (আল-বাকারা-১৮৫)

চতুর্থ: স্বয়ং সিয়ামই হলো ঐক্যের দৃষ্টান্ত ধনীরা সিয়ামের মাধ্যমে গরিবের উপবাসের কষ্ট অনুধাবন করতে পারে। যার ফলে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার পথ খুলে যায় এবং ঐক্যের বন্ধন মজবুত হয়।

৩। শারীরিক সুস্থতা
পূর্ববর্তী জাতির সিয়াম সাধনার ধরনের দিকে তাকালে দেখতে পাই- কোন কোন জাতি শারীরিক সুস্থতার গুরুত্বে সিয়াম পালন করেছে আবার কোন কোন জাতি আধ্যাত্মিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছে, যেমন পুরাতন মেক্সিকো সভ্যতা। কিন্তু ইসলামই একমাত্র ধর্ম যে আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি শারীরিক সুস্থতাকে স্থান দিয়েছে। এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা সিয়াম ফরজ করেছেন যেন তার বান্দা শারীরিক ভাবেও সুস্থ থাকে। আজকের বিজ্ঞানী এ কথাই প্রমাণ করেছেন। বিশিষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডঃ মাকফাদুন বলেন, "প্রতিটি মানুষের সিয়াম রাখা খাদ্য ও ঔষধনির্গত বিষ মানবদেহে পুঞ্জিভূত হয়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রুগ্ন ও ভারী করে তুলে। যদ্দরুন তার স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। কিন্তু যখন মানুষ সিয়াম রাখে, তখন তার এসকল খাদ্য নির্গত বিষ হ্রাস পেতে পেতে বিলীন হয়ে যায়। এতে করে তার শক্তি ও কর্মক্ষমতা ফিরে আসে।" (আস-সিয়াম মু'জিজা ইলমিয়াহ-পৃ: ১১৯-১২৫)

অবশেষে বলতে পারি-পূর্ববর্তী সকল জাতির উপরই সিয়াম ফরজ ছিল যদিও তার ধরন ভিন্ন ছিল এবং তাদের সিয়াম পরিপূর্ণ ছিল না। অবশেষে ইসলাম সিয়ামের পরিপূর্ণতা দিয়েছেন এবং সিয়ামের মূল শিক্ষা হলো-

১. সিয়াম তাকওয়া শিক্ষা দেয়।
২. সিয়াম একত্ববাদের শিক্ষা দেয়।
৩. সিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের পাশাপাশি শারিরিকভাবে সুস্থ থাকা যায়।

লেখকঃ গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ